রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা : প্রতীক প্রসঙ্গ

সিদ্দিকা মাহমুদা

'কল্পনা এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার সারবত্তা'[১] নিয়ে কবি সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় মনোনিবেশ করেন। বহির্জগতের বিচিত্র ভাববীজ কবিহৃদয়ের আবেগ ও মননের যুগ্মস্রোতে তরঙ্গিত হয়ে পাঠকের অনুভব-সৈকতে আছড়ে পড়ে, শুরু হয় পাঠকচৈতন্যে তার নবতর উদ্বোধন। সুতরাং কবি ও পাঠকের ভাববিনিময়ের সূত্র হিসেবে কর্মিষ্ঠ থাকে কবিতা নামের যে শিল্পমাধ্যম তার রূপায়ণে কবিকে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হয়। আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত নিষ্ক্রমণ নয়, বরং তার সংযত উপস্থাপন সার্থক শিল্পসৃষ্টির উপায়। এবং সেইসঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে না বলে পরোক্ষভাবে কবিতার ভাষা নির্মাণের মাধ্যমে কবি পাঠকের গ্রহণশক্তি অধিকতর উজ্জীবিত করেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি গ্রহণ করেন চিত্রকল্প-প্রতীকের মত শিল্প-প্রকরণ। অর্থাৎ, এইসব শিল্প-প্রকরণ কবির কল্পনা, চিন্তা ও অভিজ্ঞতার সারবত্তা পাঠকহৃদয়ে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব পালন করে।

প্রতীক কবি ও কবিতার ভাবানুষঙ্গে লালিত। উপমার সামীপ্যগুণ, উৎপ্রেক্ষার অভেদত্ব, চিত্রকল্পের রূপময়তা প্রতীকের পক্ষে অপরিহার্য নয়; প্রতীক যে-কোন বস্তু বা বিষয়ের উল্লেখমাত্র হতে পারে, তবে তা দিক-নির্দেশ করে কবির উদ্দিষ্ট বিশেষ ভাববলয়ের দিকে। আবার উপমা-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্পের মধ্যেও উদ্ভাসিত হয় প্রতীকের পরমার্থ। কবির বহুকৌণিক চেতনাপ্রবাহের ধারক প্রতীক

মূলত একটি ঘনবদ্ধ রূপকল্প যা একই সঙ্গে বিষয় ও বিষয়ীর মেলবন্ধন ঘটায়। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় --

> 'চিত্রকল্প' ও 'প্রতীকে'র ব্যাখ্যা যা-ই হোক না, কার্যত তাদের এক দিকে থাকে চিত্ররচনা, আর অন্যদিকে এক গভীর রহস্য, যাতে জাল ফেলে আমরা তুলে আনতে পারি--হয়তো শূন্যতা, হয়তো এক মুঠো শামুক, হয়তো কখনো মুক্তো বা আশ্চর্য উদ্ভিদ,আর কখনো যার স্তরে-স্তরে ডুবে গিয়ে বহু রত্ন উদ্ধার ক'রে আনি।[২]

ব্যাকরণ-নির্দিষ্ট অভিধা অতিক্রম করে প্রতীক হয় সুদূরপ্রসারী, কবির স্মৃতি, স্বপ্ন, ভাবনা, সংরাগ--- এককথায় চেতনালোকের অন্ধকার গুহা-গহবরে আলোক ক্ষেপণ করে তা পাঠককে তাঁর অনতিগোচর ব্যক্তিপুরাণের নিকটবর্তী করে।

রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যায়ের কাব্যচিন্তায় বিচিত্র প্রতীক ব্যবহার করেছেন অথবা বলা যায় তাঁর পরিণততর চিন্তার অনুষঙ্গী হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে এসব প্রতীক। সব প্রতীক অভিনব নয়, পূর্ববর্তী কাব্যে ব্যবহৃত অনেক প্রতীক উত্তরকাব্যে নতুন প্রমূল্য অর্জন করেছে। আমরা পরিণত-পর্যায়ের নবতর শিল্প-নিরীক্ষা গদ্যকবিতা-পর্বের উল্লেখ্যযোগ্য কিছু প্রতীক নিয়ে আলোচনা করব।

রবীন্দ্রকাব্যের একটি বহু ব্যবহৃত প্রতীক 'নদী'। একদা *নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে* যার যাত্রা শুরু, মধ্যপর্বে নানা আবর্তে-প্রতিআবর্তে বহুভঙ্গিম ও বহুজটিল হয়ে অন্ত্যপর্বে তার অনিবার্য উচ্ছিতি। নদী ও নদী-সংসক্ত বিবিধ উপাদান যেমন ঢেউ, স্রোত, তরী, নৌকা বা খেয়া, পারানি বা নেয়ে ইত্যাদিও এক্ষেত্রে প্রতীকী পরিচর্যা পেয়েছে। আমরা স্মরণ করতে পারি *কড়ি ও কোমলের বৈতরণী, সিন্ধুগর্ভ, সোনার তরী* কাব্যের *সোনার তরী* ও '*নিরুদ্দেশ যাত্রা, নদী* নামক সম্পূর্ণ

একক একটি গ্রন্থ ও অন্তর্বর্তী কবিতা, *চৈতালির পদ্মা, নদীযাত্রা, ইচ্ছামতী নদী*- প্রসঙ্গ, *ক্ষণিকা* কাব্যের *বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ, কূলে, যাত্রী, দুই তীরে* ইত্যাদি জলাশ্রয়ী কবিতানিচয়। সুরেশচন্দ্র মৈত্র লিখেছেন--

> তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) বাক-প্রতিমায় জলের কল্লোল বা সজলতাই অধিক। সম্ভবত প্রবহমানতা ও গতির প্রতি কবির ভালবাসা এই জলজগৎ থেকেই উপজাত।[৩]

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের উক্তি --

> আমি এই জলের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবি, বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গতিটাকে যদি কেবল গতিভাবেই উপলব্ধি করতে ইচ্ছা করি তা হলে নদীর স্রোতে সেটি পাওয়া যায়। মানুষ পশুর মধ্যে যে চলাচল তাতে খানিকটা চলা খানিকটা না-চলা, কিন্তু নদীর আগাগোড়াই চলছে--সেইজন্যে আমাদের মনের সঙ্গে, আমাদের চেতনার সঙ্গে, তার একটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়।[৪]
>
> (২৪ আগস্ট, ১৮৯৪)

একদিকে 'নির্জন পর্বতের স্মৃতি' এবং অন্যদিকে 'নিঃসঙ্গ সমুদ্রের আহবান' (*কোপাই/পুনশ্চ*) নিয়ে বহমান নদী রবীন্দ্রনাথকে বারংবার আকর্ষণ করেছে। তরঙ্গচঞ্চল নৃত্যপরায়ণা নদী গতির আনন্দে সমুদ্রাভিমুখী অথচ মানুষের সুখ-দুঃখের পাশ দিয়ে তার উদাসীন যাত্রা। মানবপ্রেমিক এবং দার্শনিক চেতনাবিদ্ধ, সসীম ও অসীমে সঞ্চরমান রবীন্দ্রমানসের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে তার নিকটসম্পর্ক। তাছাড়া, বরীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন যে রোমান্টিক কবিকুলের সঙ্গে তাঁদের কবিতাতেও রোমান্টিকতার বড়ো লক্ষণ হিসেবে দেখা দিয়েছে voyage প্রবণতা, যা নদী, সমুদ্র, নৌ-যাত্রার

প্রসঙ্গ–আশ্রয়ী। স্মরণীয়, কোলরিজ থেকে র‍্যাঁবো পর্যন্ত নদী-নৌকার অনুষঙ্গ কবি ও কবিতার ভাব পরিবহনে বিশেষভাবে কার্যকর।

প্রথম যৌবনে এই নদীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের অনেকসময় অতিবাহিত করেছেন। *ছিন্নপত্রের* পাতায় পাতায়, '*জীবনস্মৃতি*'র চিত্রশালায়, *গল্পগুচ্ছের* বিচিত্র পরিবেশে ললিতে-কঠোর মিশ্রিত নদীপ্রবাহের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। *ছিন্নপত্রের* রবীন্দ্র-অনুভব স্মরণযোগ্য --

> আজ নদীর কলধ্বনির প্রত্যেক তরলল'কার আমার সর্বাঙ্গে যেন কোমল আদর বর্ষণ করছে--মনটি আমার আজ অত্যন্ত নির্জন এবং সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। মেঘমুক্ত আলোকে-উজ্জ্বল শস্যহিল্লোলিত জলকল্লোলিত চতুর্দিকটার সঙ্গে মুখোমুখি বিশ্রব্ধ প্রীতিসম্মিলনের উপযুক্ত একটি নীরব গোপনতা আমার মধ্যে স্থিরভাবে বিরাজ করছে।[৫]
>
> (৮ আগস্ট, ১৮৯৪)

অথবা পোস্টমাস্টার গল্পের কালপ্রবাহ--

> যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারি দিকে ছল্‌ ছল্‌ করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন-- একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল 'ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সে অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি।' কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা গিয়াছে --এবং নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল--জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে। ফিরিয়া ফল কী? পৃথিবীতে কে কাহার?[৬]

এইসূত্রে স্মৃতিগোচর হয় *খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন* গল্পের ট্রাজেডি। বিপরীতক্রমে 'যখন যেমন মনে করি/ তাই হতে পাই যদি'র (*ইচ্ছামতী, শিশু ভোলানাথ*) ইচ্ছামতী নদীর প্রসঙ্গও স্মরণ করা যেতে পারে।

যেহেতু শেষপর্বের অধিকাংশ কবিতাই স্মৃতিধৃত, তাই গদ্যকবিতা পর্যায়েও স্মৃতিচারণ লক্ষণীয়।

একদিন ছিলেম ওরই চরের ঘাটে,
নিভৃতে, সবার হতে বহুদূরে।
ভোরের শুকতারাকে দেখে জেগেছি,
ঘুমিয়েছি রাতে সপ্তর্ষির দৃষ্টির সম্মুখে
নৌকার ছাদের উপর।
আমার একলা দিন-রাতের নানা ভাবনার ধারে ধারে
চলে গেছে ওর উদাসীন ধারা--
পথিক যেমন চলে যায়
গৃহস্থের সুখদুঃখের পাশ দিয়ে, অথচ দূর দিয়ে।

(*কোপাই/ পুনশ্চ*)

পুনশ্চের প্রথম কবিতা *কোপাই*। এই কোপাই ভয়ংকরী পদ্মা নয়, 'ভরা নদী ক্ষুরধারা/ খরপরশা (*সোনার তরী/ সোনার তরী*) অথবা নয় পতিসরের গ্রাম্য নাগর নদী--'ক্ষুদ্র শীর্ণ নদীখানি শৈবালে জর্জর/স্থির স্রোতোহীন' (*মধ্যাহ্ন/চৈতালি*)। কোপাই সাঁওতালী যুবতীর মত কলমুখর, আলোছায়ায় বঙ্কিম, সে 'ভাঙে না, ডোবায় না, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আবর্তের ঘাঘরা' দিয়ে দুই তীরকে আঘাত হেনে উচ্চহাস্যে ধাবিত হয়। গদ্যকবিতা-পর্বে মনুষ্যসংসারের সঙ্গে একাত্ম হতে চাওয়া কবিমানসের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে তার জলে-স্থলে বাঁধা-

পড়া রূপ। আবার, কবির নবসৃষ্ট রূপশৈলী যা যুগপৎ গদ্য ও কবিতার ধর্মবহ, যেখানে মানবিক সংসার ছাড়পত্র পেয়েছে, তার সঙ্গেও তার অন্বয়।

বাসা কবিতায় এসেছে ময়ূরাক্ষী নদীর কথা। এ নদী রোমান্টিক কবির স্বপ্নের প্রতীক। হৃদয়ের গোপন মাধুর্য- নিষিক্ত একান্ত কিছু প্রার্থনা যা বাস্তব রূপলাভে ব্যর্থ, তারই বার্তাবহ এই নদী--যার সঙ্গে কবির কখনও দেখা হয়নি, অথচ যার উপরে সাঁকো বেধে দু'পাশে জুঁই, বেল, রজনীগন্ধার কাঁচের টব সাজিয়ে তিনি বাসা বেঁধেছেন।

ময়ূরাক্ষী নদী দেখিও নি কোনো দিন
ওর নামটা শুনি নে কান দিয়ে,
নামটা দেখি চোখের উপরে--
মনে হয় যেন ঘন নীল মায়ার অঞ্জন
লাগে চোখের পাতায়।

(*বাসা/পুনশ্চ*)

অর্থাৎ নদী এখানে শান্তি, স্থিরতা, কল্যাণ ও নিরুদ্বেগ আশ্রয়ের প্রতীক। এর নামের মধ্যে যে ব্যঞ্জনা তা সহজেই পাঠকহৃদয়ে সঞ্চারিত হয়।

এই প্রসঙ্গে *বাঁশি* কবিতার ধলেশ্বরী নদীর কথা স্মরণ করা যায়। ময়ূরাক্ষী নদীর মতই ধলেশ্বরীর তীরে হরিপদ কেরানির সব স্বপ্ন সব গান সত্য হয়ে ওঠে। তার 'তীরে তমালের ঘন ছায়া' এবং সেখানে 'আঙিনাতে/ যে আছে অপেক্ষা করে, তার/ পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।' কিন্তু হরিপদের সেখানে কখনো যাওয়া হয়নি, হবেও না।

বিশ্বশোক কবিতায় দার্শনিক নিরাসক্তি, নদীও নয় বাস্তব; 'হৃদয়েতে মহানদী' বয়ে চলেছে 'সব মানুষের জীবনস্রোতে ঘরে ঘরে'। *পুনশ্চ* গ্রন্থ রচনাকালে কবির একমাত্র দৌহিত্র বিদেশে প্রশিক্ষণরত নীতিন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি কঠিন অসুখে মৃত্যুবরণ করেন। কাব্যগ্রন্থটি 'নীতু'র নামে উৎসর্গিত। *বিশ্বশোক* কবিতার রচনাকাল ১১ই ভাদ্র, ১৩৩৯। ঠিক পরদিন কন্যা মীরাদেবীর কাছে লিখিত পত্রাংশে রবীন্দ্র-মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়--

> শমী যে রাত্রে চলে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়েছে তার লক্ষণ নেই। মন বললে কম পড়ে নি--সমস্তের মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তারি মধ্যে। সমস্তর জন্যে আমার কাজও বাকি রইল।[৭]
>
> (১২ ভাদ্র, ১৩৩৯)

বিশ্বশোক কবিতায় ব্যক্তিগত শোক বিশ্বগত শোকে অবসিত-'ক্রন্দন তার হাজার তানে' 'বিশাল বিশ্বসুরে' মেলানো।

কাব্যজীবনের সমাপ্তিসূচক *পরিশেষের* গহ্বরে যেমন '*পুনশ্চে*'র উত্থান, তেমনি '*পুনশ্চ*' থেকে আবার রবীন্দ্রনাথের '*শেষ সপ্তকে*' প্রত্যাবর্তন। জীবন-মৃত্যু-অস্তিত্ব নিয়ে ভাবিত রবীন্দ্রমানসের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে '*শেষ সপ্তকে*' নদীস্রোত নিয়ত প্রবহমান অস্তিত্বের ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

> চারদিক থেকে অস্তিত্বের এই ধারা
> নানা শাখায় বইছে দিনেরাত্রে।
> অতি পুরাতন প্রাণের বহুদিনের নানা পণ্য নিয়ে
> এই সহজ প্রবাহ,--
> মানব-ইতিহাসের নূতন নূতন

ভাঙনগড়নের উপর দিয়ে
এর নিত্য যাওয়া আসা।
(চার/ শেষ সপ্তক)

বহুবর্ণিল, বিচিত্ররাগরঞ্জিত এই জীবন যা একই সঙ্গে আনন্দ ও ক্লান্তির অজস্র পাথেয় নিয়ে চলিষ্ণু, মৃত্যুকে সঙ্গে নিয়েই তার চলা। মৃত্যুর অমোঘ আকর্ষণে সব সঞ্চয় পশ্চাতে ফেলে এগিয়ে যেতে হয়। অনিবার্যভাবে এই গতি অন্বিত হয় স্রোতের প্রতীকে। 'পঁচিশে বৈশাখ' 'জন্মদিনের ধারাকে বহন করে' নিয়ে যায় 'মৃত্যুদিনের দিকে' (*তেতাল্লিশ/ঐ*)। মৃত্যু-রূপী মহাসমুদ্রের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়--

যখন বইল জীবনের ধারা
আমি এসেছি তার পিছনে পিছনে,
দিইনি তাকে কোনো গর্তে আটক থাকতে।
তীরের বাঁধন কাটিয়ে কাটিয়ে
ডাক দিয়ে নিয়ে গেছি মহাসমুদ্রে,
সে সমুদ্র আমিই।
(*উনচল্লিশ/ঐ*)

কবিচেতনার রং-বদলের সঙ্গে সঙ্গে প্রতীকেরও রূপান্তর ঘটে। তাই পরবর্তী কাব্য পত্রপুটের প্রশান্ত কবিহৃদয় শেষ শরতের প্রশান্তিমাখা পদ্মার প্রতীকে আত্মবিস্তার করে।

আমার মনের মধ্যে ছুটি নেমেছে
যেন পদ্মার উপরে শেষ শরতের প্রশান্তি।
বাইরে তরঙ্গ গেছে থেমে,
গতিবেগ রয়েছে ভিতরে।
সাজ হল দুই তীর নিয়ে

ভাঙন-গড়নের উৎসাহ।
ছোটো ছোটো আবর্ত চলেছে ঘুরে ঘুরে
আনমনা চিত্রপ্রবাহে ভেসে-যাওয়া
অসংলগ্ন ভাবনা।
সমস্ত আকাশের তারার ছায়াগুলিকে
আঁচলে ভরে নেবার অবকাশ তার বক্ষতলে
রাত্রের অন্ধকারে।
(*দুই/পত্রপুট*)

ধান কেটে নেয়া খেতের শূন্যতা আজ কবির চারদিকে, তাঁর সব কর্ম-

উদ্দীপনা স্মৃতিমাত্র। অতএব, তীরে তীরে অফুরন্ত ভাঙা-গড়ার উৎসাহে আবর্ত-ফেনিল প্রথম কাব্যজীবনের অথবা গল্পগুচ্ছ-পর্বের পদ্মার দেখা মেলে না, পত্রপুটে পদ্মার গতিবেগ মন্থর, ছোটো ছোটো ভাবনার আবর্তে অনুচ্ছ্বসিত, বাইরে নিস্তরঙ্গ কিন্তু ভিতরে ভিতরে অজস্র টানাপোড়েনে অস্থির, সেখানে অন্ধকার ঘনীভূত হয় দূর নক্ষত্রের অসীমতাকে আত্মস্থ করার আয়োজনে।

অবসাদের বিষাদ ঘেরা মৃত্যুর সংকেত-আশ্রয়ী অপর একটি স্তবক--

মধ্যদিনের নিঃশব্দ প্রহরে
অকাজে ভেসে যায় আমার মন
ভাবনাহীন দিনের ভেলায়।
সংসারের ঘাটের থেকে রশি-ছেঁড়া এই দিন
বাঁধা নেই কোনো প্রয়োজনে।

রঙের নদী পেরিয়ে সন্ধ্যাবেলায় অদৃশ্য হবে
নিস্তরঙ্গ ঘুমের কালো সমুদ্রে।
(সাত/ পত্রপুট)

পত্রপুটের প্রথম কবিতায় লক্ষ করা যায় পর্বতারোহী অভিযাত্রীদলের ফেনিল-মদির অবকাশ-যাপনের তীব্র আগ্রহ অবসিত হয়েছে যে শিখর-চূড়ায় সেখানে সূর্য নমিত-প্রায়, 'নদীজালের রেখাঙ্কিত বহু দূরবিস্তীর্ণ উপত্যকা' প্রসারিত। এখানেও নদী-প্রতীকে উত্তাল গতিবেগ নেই, 'জাল' এবং 'রেখা' শব্দদ্বয় একদিকে জীবনের জটিলতা ও কুটিলতা এবং অন্যদিকে শুধু দৃশ্যধর্মিতার অনুষঙ্গ বহন করেছে। অর্থাৎ অন্ত্যপর্বে নতুন করে সৃষ্টির কিছু নেই, কেবল স্মৃতিপটে দৃষ্টিপাত।

কখনও বিশ্ব-ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি ফেরান কবি। চোখে পড়ে

'শতাব্দীর নিরন্তর স্রোতের' নিরবধি প্রবাহ--

বিলম্বিত তালের তরঙ্গের মতো,
যে ধারায় উঠল নামল কত শৈলশ্রেণী,
(আট/ পত্রপুট)

সমগ্র জীবজগতের বিচিত্র উত্থান-পতনবহ কালের দীর্ঘপ্রবাহ পুনরায় স্রোতের প্রতীকে প্রকাশমুখী। রবীন্দ্রচেতনার বিচিত্র প্রান্ত স্পর্শ করে এইভাবে নদী-প্রতীকের অগ্রযাত্রা। তাঁর 'ভালোবাসার ধারা'ও জলজ অনুষঙ্গ-আশ্রিত; কখনও নদী, কখনও মহাসমুদ্র-- কখনও প্রতিদিনের তুচ্ছতা-ক্ষুদ্রতা ভরা গৃহকোণ, কখনও ধ্যানের বিস্তৃত অঙ্গনে নভোস্পর্শী বিস্তার--

ভালোবেসেছি তাকে।
সেই ভালোবাসার একটা ধারা
ঘিরেছে তাকে স্নিগ্ধ বেষ্টনে
গ্রামের চিরপরিচিত অগভীর নদীটুকুর মতো।
অল্পবেগের সেই প্রবাহ
বহে চলেছে প্রিয়ার সামান্য প্রতিদিনের
অনুচ্চ তটচ্ছায়ায়।
... ...
আমার ভালোবাসার আর একটা ধারা
মহাসমুদ্রের বিরাট ইঙ্গিত-বাহিনী।
মহীয়সী নারী স্নান করে উঠেছে
তারই অতল থেকে।
(পনেরো/ পত্রপুট)

পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ শ্যামলী, যেখানে সত্তর-উত্তীর্ণ কবির বেলাশেষের সুরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অজয় নদের আবির্ভাব। কবির চোখে উদ্ঘাটিত অকাল ঘুমের অবসন্নতা-মাখা নায়িকার শিথিলদেহ--

কর্মস্রোত নিস্তরঙ্গ ওর অঙ্গে অঙ্গে,
অনাবৃষ্টিতে অজয় নদের
প্রান্তশায়ী শ্রান্ত জলশেষের মতো।
(অকাল ঘুম/শ্যামলী)

অমৃত কবিতায়--

ক্ষীণ নদীটি ঝরে পড়ছে পাহাড় থেকে
পাথরের ধাপে ধাপে।

নুড়ি ডিঙিয়ে বেঁকে চলা
তার ফটিক জলের কলকলানি
ধরিয়ে রেখেছে একটি মূল সুর নির্জনতার।

কবিচেতনার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত স্রোতের উন্মাতাল অনুষঙ্গ 'ক্লান্ত শরীর ব্যস্ত মনকে ফিরিয়েছে/ শান্ত রক্তধারার স্নিগ্ধতায়/কর্মের নেশার ঝাঁজ এল মরে' (ঐ)। -- তাই বহতা নদীর প্রতীক বহুব্যবহারে বিচিত্র হয়ে ওঠেনি।

নদীর প্রসঙ্গে 'নৌকা' প্রতীকের আগমন। রবীন্দ্রকাব্যে 'নৌকা'র প্রথমাবধি এত বহুল প্রয়োগ যে, কবিচেতনার আবহ নির্মাণে জলযানটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। রবীন্দ্রজীবনের প্রথম পর্বে পদ্মাবক্ষে বোটে দীর্ঘসময় যাপনকালে বিশাল জলধিবক্ষের এই একমাত্র আশ্রয় কখনও হয়ে উঠেছে নিরুদ্দেশ যাত্রার সহচর--

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী?
বলো, কোন্ পার ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী।

(নিরুদ্দেশ যাত্রা/সোনার তরী)

সোনার তরী কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতাও এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

ওগো, তুমি কোথা যাও কোন্ বিদেশে
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে।

কিন্তু মহাকালের প্রতীক সেই নিস্পৃহ নৌকা, মানুষের কর্মের দায়িত্ব নিলেও ব্যক্তিমানুষের জন্য তার কোন দায় নেই।

গদ্যকবিতা-পর্বে *পুনশ্চ* কাব্যের *অপরাধী*, কবিতায় পাওয়া যায় তিনুকে, মনটা যার হাল্কা ছিপছিপে নৌকার সঙ্গে তুলিত, এ-পারের বোঝা ও-পারে নামিয়ে সে খালাস, কিছুই জমে থাকে না, কিছুই জমতে দেয় না।

মনটা ওর হাল্কা ছিপ্‌ছিপে নৌকো,
হু হু করে চলে যায় ভেসে;
ভালোই বল আর মন্দই বল
জমতে দেয় না বেশিক্ষণ,--
এ পারের বোঝা ও পারে চালান করে দেয়
দেখতে দেখতে;
ওকে কিছুই চাপ দেয় না,
তেমনি ও দেয় না চাপ।

সোনার তরী কাব্যের ভারবাহী নৌকা নয়, চরম ঔদাস্যে যে প্রত্যাখ্যান করে মানুষের আকুল প্রার্থনা, এ নৌকা কেবলি গতির আনন্দে মুখর, অবিরত ভেসে যাওয়ার প্রতীক। অনুরূপ অনুভাবনা *দেখা* কবিতায়--

মন বলে, এই আমার যত দেখার টুকরো
চাই নে হারাতে।
আমার সত্তর বছরের খেয়ায়
কত চল্‌তি মুহূর্ত উঠে বসেছিল,
তারা পার হয়ে গেছে অদৃশ্যে।

সত্তর বছরের দীর্ঘ কবিজীবনে কত রঙিন মুহূর্তের সমবায়, কিন্তু সময়ান্তরে সবই অন্তর্হিত। মানবজীবনে কিছুই স্থায়ী নয়, সবই অস্থির এবং অনিত্য। এই একহাতে সঞ্চয় এবং অন্য হাতে শূন্য করে দেয়া পরম নির্লিপ্তির সঙ্গে খেয়া- পারাপারের প্রতীকে অভিব্যক্ত। সাধারণ মেয়ে কবিতায় মালতীকে মনে হয়েছে ঢেউয়ের উপর পাল তোলা নৌকা, যে অনায়াসে সবকিছু উপেক্ষা করে চলে। ক্রমাগত ভেসে যাওয়া এবং ভাসিয়ে নেওয়ার প্রসঙ্গে নদী-কেন্দ্রিক 'নোঙর' এবং 'স্রোতে'র অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে যথাক্রমে *সুন্দর* ও *ঘরছাড়া* কবিতায়। 'বর্তমানের নোঙর-ছেঁড়া ভেসে যাওয়া এই দিন' যেমন কোন দায় মানেনি, তেমনি 'মন যে ওদের স্রোতের মতো/সব কিছুরেই ভাসিয়ে চলে--' 'শিকড়-বাঁধা গাছের মতো' কোথাও আটকা পড়ে না।

কেবল দার্শনিক প্রেক্ষাপট নয়, এই যে কোথাও বাঁধা না পড়ার অনুষঙ্গে নদী, নৌকা, স্রোতের ব্যবহার তার নেপথ্যে কি রয়েছে রবীন্দ্রমানসের কোনো গূঢ় বন্ধন যা তিনি এড়িয়ে চলতে বা উপেক্ষা করতে চাইছেন? পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগে সমাপ্তিবোধক *পরিশেষের* পর কবি কেন আবার *পুনশ্চের* দ্বারস্থ? গদ্য কবিতার নতুন আঙ্গিকে কেন তাঁর আত্মপ্রকাশের আয়োজন? তাঁর কাঙ্ক্ষিত সিদ্ধি কি তিনি এখানে অর্জন করতে পেরেছেন? আমরা স্মরণ করতে পারি সমকালের রবীন্দ্রমানসের যন্ত্রণাবোধ, একদিকে মৃত্যুর অভিঘাত এবং অন্যদিকে নবীন কাব্যযাত্রার সঙ্গে দ্বন্দ্ব--সবই হয়তো এ সময় রবীন্দ্রমানসে এক ধরনের প্রতিবন্ধকতার অনুভব জাগ্রত করেছিল, যেখানে উপেক্ষা বা অবহেলার মনোভাব ছিল পাশাপাশি গ্রথিত। এবং এই চেতনাই উল্লিখিত প্রতীকাশ্রয়ে বাঙ্ময়। উল্লেখ্য, প্রতিবন্ধকতার

প্রতীক 'বেড়া' গদ্যকবিতা–পর্যায়ে প্রায়শ ব্যবহৃত হয়েছে। *শেষ সপ্তকের* কাব্যজাত অনুভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে 'প্রৌঢ় বসন্তের পারের খেয়া/ চৈত্রমাসের মধ্যস্রোতে' (আট) ভাসমান অথবা 'আকাশে ভাসা বসন্তের নৌকায়/ পাল পড়েছে ঢিলে হয়ে' (এগারো)। *পুনশ্চে* ছিল পাল উড়িয়ে নবতর যাত্রার আয়োজন, *শেষ সপ্তক* তার বিপরীত। পুনরায় '*পরিশেষে*'র অনুচিন্তায় গ্রস্ত কবিমানস। রবীন্দ্রচেতনা মূলত কম্বুরেখায় অগ্রসরমান, ঘুরে ঘুরে বার বার তার নিজের সঙ্গে নিজের দেখা। স্মৃতিমন্থন করেছেন কবি, তাঁর জীবন–তরী কত বিষম কত বিপরীতের সম্মুখীন হয়েছে--

নির্মম কঠোরতা মেরেছে ঢেউ
আমার নৌকার ডাইনে বাঁয়ে,
জীবনের পণ্য চেয়েছে ডুবিয়ে দিতে
নিশার তলায়, পঙ্কের মধ্যে।
(*তেতাল্লিশ, শেষসপ্তক*)

কখনও কবি অনুভব করেছেন 'আয়ুর তরণী/ যৌবনের ঘাট গেছে পেরিয়ে' (*পঁয়তাল্লিশ/ঐ*)। কখনও সেখানে এসে লেগেছে আকস্মিকের অভিঘাত--প্রগাঢ় হয়েছে পূর্বজ অনিত্যের চেতনা--

যেন হঠাৎ ঝঞ্ঝার ঝাপটা লেগে
কোন্ মহাতরী
হঠাৎ ডুবল ধূসর সমুদ্রতলে,
সকল আশা নিয়ে, গান নিয়ে, স্মৃতি নিয়ে।
(চৌত্রিশ, ঐ)

এবং শেষ সপ্তকের শেষ কবিতার সর্বশেষ স্তবকে কবির উক্তি--

আজ নেব মুক্তি।
সামনে দেখছি সমুদ্র পেরিয়ে
নতুন পার।
তাকে জড়াতে যাব না
এ পারের বোঝার সঙ্গে।
এ নৌকায় মাল নেব না কিছুই
যাব একলা
নতুন হয়ে নতুনের কাছে।
(ছেচল্লিশ)

প্রয়োজনের সহস্র শিকলে গ্রন্থিবদ্ধ জগতের সঙ্গে এবার বন্ধনমুক্তির পালা। নৌকা এসেছে পরিত্রাণের উপায় হয়ে। মহাসমুদ্রের নতুন তীরে উত্তীর্ণ হওয়ার বাহন এই নৌকা। এ নৌকা সোনার তরী নয়, *শেষসপ্তকের* এ নৌকায় কবি কোন সামগ্রী নিতে চাননি, সকল কর্মের ভার পশ্চাতে ফেলে নূতন হয়ে নূতনের দিকে সঙ্গহীন যাত্রা তাঁর কাঙ্ক্ষিত।

পত্রপুটে নৌকা-প্রতীকের ব্যবহার তেমন নেই। কোথাও অলস মনের ভাবনাবহ 'ভাবনাহীন দিনের ভেলা' (*সাত*) অথবা ছেলেদের ভাসিয়ে দেয়া 'খেলার নৌকা' (*বারো*) দৃষ্টিগোচর হলেও এখানে বিদায়ের নিত্যভাটায় মহাকালের দীর্ঘনিঃশ্বাস শ্রুত হয়। সুতরাং অনিবার্য হয়ে ওঠে 'নিঃশেষে মিলিয়ে যাবার খেয়া' (দুই)।

শ্যামলীতে নৌকা আবার ডাঙায়-তোলা, ভাঙা (*শেষপহরে*); কখনও তা 'ভেসে-যাওয়া পারের খেয়া' (বিদায়-বরণ) কখনও পারানি নৌকা আটকে গেছে 'কালস্রোতের ওপারে বালুডাঙায়'

(*বাঁশিওয়ালা*), কখনও দুজনের নৌকাচালনা থেকে একজন গেছে নেমে (*মিলভাঙা*)। অর্থাৎ, *নিরুদ্দেশ যাত্রার* রোমান্টিকতা বা শুধু গতির আনন্দে বাতাসে ফুলে ওঠা পালের স্বপ্ন নয়, জীবনতরীর বিভগ্ন রূপ মালার্মের ভগ্নতরী বা মগ্নতরীর ব্যঞ্জনাবহ, যদিও মালার্মীয় তীব্র নঞর্থকতা রবীন্দ্রনাথে নেই। কারণ, এই জীবনতরী স্রোতে ভাসানোর প্রথম স্মৃতি এখনও কবিহৃদয়ে সমুজ্জ্বল--

এই তরীটিকে প্রথম দিয়েছিলে ঠেলে
কিশোর-বয়সের শ্যামল পারের থেকে;
এর মধ্যে আছে তার বেগ।
আজ মাঝনদীতে সারিগান গাইব যখন
তোমার নাম পড়বে বাঁধা
তার হঠাৎ তানে।
(মিলভাঙা, শ্যামলী)।

তবে, শেষ পর্যায়ের প্রাজ্ঞ কবিচেতনার অন্তঃশীল বিষণ্ণতা, নঞর্থকতা, সমাপ্তিবাচকতা এবং ধূসরতার বোধ অনিবার্য করেছে অন্ধকার-প্রসঙ্গ। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন পরিশেষ থেকেই মূলত কবিচেতনায় অন্ধকার প্রাধান্য পেয়েছে।

'পূরবী'র ''বৈতরণী'' ও ''অন্ধকার'' কবিতা দুটিতে সমাসন্ন দিনান্তের অন্ধকারের চিত্রকল্প অবশ্য একান্তভাবেই ব্যক্তিগত অন্ধকার। যে অন্ধকারের কাছে কবির ব্যক্তিগত প্রণাম আসলে আলোকেরই তপস্যা। কিন্তু ''পরিশেষ'' পর্যায়ে অন্ধকারের পটভূমিটি হয়ে উঠল অনড়। আন্তর্জাতিক, স্বাদেশিক ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সমাহারে এই কালো ডানা মেলে-দেওয়া অন্ধকারের পাখি কবির অনেকগুলি চিত্রকল্পে নতুন ভেহিক্‌ল রচনা করেছে।[৮]

পুনশ্চ-পর্যায়ে অন্ধকার দৃঢ়মূল হতে পারে না, কারণ নূতনতর সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় উদ্বেল কবিচেতনা। তথাপি *শিশুতীর্থ* নামক বিখ্যাত কবিতায় (অবশ্য এই কবিতাটি *পরিশেষ* পর্যায়ের বলে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিমত প্রকাশ করেছেন) দীর্ঘ রাত্রির বিস্তার।

রাত কত হল?
উত্তর মেলে না।
কেননা, অন্ধ কাল যুগ-যুগান্তরের গোলকধাঁধায় ঘোরে,
পথ অজানা,
পথের শেষ কোথায় খেয়াল নেই।
পাহাড়তলিতে অন্ধকার মৃত রাক্ষসের চক্ষুকোটরের মতো;
স্তূপে স্তূপে মেঘ আকাশের বুক চেপে ধরেছে;
পুঞ্জ পুঞ্জ কালিমা গুহায় গর্তে সংলগ্ন,
মনে হয় নিশীথরাত্রের ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ;

এই অন্ধকার মানুষের যুগযুগব্যাপী অজ্ঞতা ও মূর্খতার প্রতীক, পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস ও কলহের বর্ণলেপন যা নেতৃত্বে অনাস্থাজ্ঞাপন করে, সত্য ও সঠিক পথ নির্ধারণে বিঘ্নস্বরূপ, প্রেম ও প্রেরণার পথে যা বিস্তার করে হিংস্রতা ও কুটিলতার মারীবীজ।

মূল ইংরেজি কবিতা *The child* -এর রূপান্তর 'শিশুতীর্থ', জার্মানির মিউনিক শহরে ১৯৩০ সালে রচিত। যীশুখ্রীষ্টের জীবনের শেষাংশ অবলম্বনে অভিনীত নাটক দেখে রবীন্দ্রনাথ কবিতাটি রচনা করেছিলেন। হিংস্র পশু- শক্তির হাতে মানবাত্মার অপমান ও লাঞ্ছনা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ভাষারূপপ্রাপ্ত। কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'বিচিত্রা', ১৩৩৮, ভাদ্র সংখ্যায়, যার শিরোদেশে উৎকীর্ণ ছিল অথর্ববেদের একটি শ্লোক-- 'সনাতনম্ এনম্ আহুর্ উতাদ্যস্যাৎ

পূনর্ণবঃ। ইনি সনাতন, ইনিই অদ্য পুনর্ণব। অথর্ববেদের এই মন্ত্রেও রয়েছে শাশ্বত সত্যকে চিনে নেয়ার আহ্বান। আমরা লক্ষ্য করি, *শিশুতীর্থ* কবিতায় অন্ধকার লেপ্টে থাকে ততক্ষণ, যতক্ষণ পর্যন্ত যাত্রীদল সঠিক পথের সন্ধান না পায়।

রৌদ্রদগ্ধ বৈশাখের দীর্ঘ প্রহর কাটল পথে পথে।
সন্ধ্যাবেলায় আলোক যখন ম্লান তখন তারা কালজ্ঞকে শুধায়,
ওই কি দেখা যায় আমাদের চরম আশার তোরণচূড়া।
সে বলে, না, ও যে সন্ধ্যাভ্রশিখরে অস্তগামী সূর্যের বিলীয়মান আভা।
তরুণ বলে, থেমো না বন্ধু, অন্ধতমিস্র রাত্রির মধ্য দিয়ে
আমাদের পৌঁছতে হবে মৃত্যুহীন জ্যোতির্লোকে।
অন্ধকারের তারা চলে।

'অন্ধকার' *শাপমোচন* কবিতায় অন্তর্লগ্ন। কুশ্রী রাজা ভীরুতার অন্ধকারে আত্মগোপন করে, রাজা ও রানীর বিরহসমুদ্র যখন একাকার হয়ে যায়, তখন রানী কমলিকা যেন তামসী তপস্বিনী,--নীরব নক্ষত্রের জপমন্ত্রে সত্য-সুন্দরকে চেনার সাধনায় সমর্পিত-প্রাণ। অবচেতনের প্রতীকী রূপে অন্ধকার বিরহের আহ্বান-বাণী মূর্ত করে--

কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ ডুবেছে অমাবস্যার তলায়।
আঁধারের ডাক কী গভীর।
পথ-না-জানা যত-সব গুহা-গহ্বর মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন,
এই ডাক সেখানে গিয়ে প্রতিধ্বনি জাগায়।

আবার এই অন্ধকারই তরল হয়ে সুরের রূপতরঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, চতুরঙ্গ উপন্যাসে শচীশ-দামিনীর অবচেতন

মনের রহস্যময়তা, যা গুহায়িত অন্ধকারের প্রতীকে অধিকতর তীব্র রূপলাভ করেছে।

অন্ধকারের সূত্রে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় *পুনশ্চ*-কাব্যের চাঁদ--তার ঔজ্জ্বল্যে নয়, নিষ্প্রভ অন্ধকারগামিতা নিয়ে অস্তিত্ববান। চিররূপের বাণী কবিতায় চাঁদ কৃশ, ক্লান্ত কৃষ্ণচতুর্দশীর এবং সেখানে প্রাঙ্গণে নেমেছে অকাল সন্ধ্যার ছায়া 'সূর্যগ্রহণের কালিমার মতো', কেননা মৃত্যুদূত দুয়ারে সমাগত।*প্রথম পূজা* কবিতায় চাঁদের উপর পড়েছে খোলা আবরণ, 'জ্যোৎস্না আজ ঝাপসা-/যেন মূর্ছার ঘোর লাগল', কারণ আকাশ-পাতাল বিদীর্ণ করে বেজে উঠছে প্রলয়ের শব্দ, ছুটছে ঘূর্ণি-ঝড়ের মেঘ, কবিতার উপান্ত্যের চরম দুর্যোগ ও পরম শূন্যতা সার্বিক ধ্বংসযজ্ঞে সুপরিস্ফুট।

শেষ সপ্তকের তমিস্রা অতলান্তিক। কখনও কবিকণ্ঠে ধ্বনিত তিমির-বন্দনা--

নামস্কালন যে পবিত্র অন্ধকারে ডুব দিয়ে
তোমাদের সাধনাকে করেছিলে নির্মল,
সেই অন্ধকারের মহিমাকে
আমি আজ বন্দনা করি।
(আট

কখনও অনুভূত অদৃষ্টের দুর্মোচ্য চক্রান্ত এই অন্ধকার হাতড়ে বেড়ানো; তখন উঠে আসে এক শূন্যতা থেকে আরেক শূন্যতায় ঝাঁপ দেয়ার মর্মান্তিক চিত্র--

মনে হয়েছিল আজ সব-কটা দুর্গ্রহ
চক্র ক'রে বসেছে দুর্মন্ত্রণায়।

অদৃষ্ট জাল ফেলে অন্তরের শেষ তলা থেকে
টেনে টেনে তুলছে নাড়ি-ছেঁড়া যন্ত্রণাকে।
মনে হয়েছিল, অন্তহীন এই দুঃখ;
মনে হয়েছিল, পন্থহীন নৈরাশ্যের বাধায়
শেষ পর্যন্ত এমনি করে
অন্ধকার হাতড়িয়ে বেড়ানো।
ভিতসুদ্ধ বাসা গেছে ডুবে,
ভাগ্যের ভাঙনের অপঘাতে।

(দশ)

কখনও 'কালো অন্ধকারের তলায় পাখির শেষ গান গিয়েছে ডুবে' (*চোদ্দো*), অর্থাৎ এরপর তীব্র ও গভীর নাস্তি। এই অন্ধকারের সঙ্গে কোথাও যুক্ত 'অজানা শৈলগুহা'র অনুষঙ্গ (*বিশ*), কোথাও 'যুগান্তের রাত্রি' উপমিত 'শবাসনে শান্তিমন্ত্র' উচ্চারণকারী 'সাধকের' সঙ্গে (*চল্লিশ*)। আবার কখনও কবির দৃষ্টিগোচর হয়েছে 'তিমিরধারায় ক্ষালন করেছে কে/ ধূলিশায়ী শতাব্দীর আবর্জনা' (*ঐ*)। *শেষ সপ্তকে* অন্ধকার চরণে চরণে গ্রথিত হলেও আলোর প্রতীক্ষা মুছে যায়নি; অনেক ক্ষেত্রে আলো-অন্ধকারের যুগ্ম ব্যবহার কবিমনের ইতি-নেতির দ্বন্দ্ব-নির্দেশক। কিন্তু যেহেতু আত্মানুসন্ধানের এই পর্বে কবি অনুভব করেছেন অচরিতার্থতার বাষ্প জড়িয়ে ধরেছে তাঁর সমগ্র অস্তিত্ব, উপরন্তু রয়েছে বিশ্বব্যাপী চরম ধ্বংসযজ্ঞের আয়োজন, তাই অন্ধকার নেতিবাচক নৈরাশ্যের প্রাবল্য ঘোষণা করেছে।

পত্রপুট কাব্যের অন্ধকার *শেষ সপ্তকের* ন্যায় এত প্রগাঢ় না হলেও বিভিন্ন কবিতায় ব্যবহৃত দিনাবসান, গোধূলি, সূর্যাস্ত, সন্ধ্যা ও

রাত্রির অনুষঙ্গ অন্ধকার সংকেতিত করে। অন্ধকার-উৎকীর্ণ কবিতাংশ তুলনামূলকভাবে স্বল্প, তবে তার তীব্রতা অনুভবগম্য--

এক. বিকালবেলার রৌদ্রকে যেমন উজাড় করে দিনান্ত
শেষ-গোধূলির ধূসরতায়
তেমনি সোনার ফসল চলে গেল
অন্ধকারের অবরোধে।

(চার)

দুই. তীক্ষ্ণ হাওয়া সাঁই সাঁই শান দিচ্ছে আর চালাচ্ছে ছুরি
অন্ধকারের পাঁজরের ভিতর দিয়ে।

(নয়)

তিন. আমি বাস করি
তোমার ভাঙা ঐশ্বর্যের ছড়ানো টুকরোর মধ্যে।
আমি খুঁজে বেড়াই মাটির তলার অন্ধকার,
কুড়িয়ে রাখি যা ঠেকে হাতে

(এগারো)

চার. নিশীথরাত্রের জপমন্ত্র ছন্দ পেয়েছে
তার তিমিরপুঞ্জ কলোচ্ছল ধারায়।

(বারো)

উল্লেখ্য, *পত্রপুটে* কালো রঙের অকাতর প্রকাশ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাছাড়া 'কালো'র অনুগামী পাণ্ডুর, ধূসর, পাটকিলে, গেরুয়া বা ফিকে রং-ও এখানে সহবাসী।

শ্যামলী কাব্যের *আমি* কবিতার কবিচেতনায় আভাসিত 'অনন্ত রাত্রির কালি', যেদিন কবিত্বহীন বিধাতা একা রইবেন জেগে এবং 'মর্ত্যলোকে মহাকালের নূতন খাতায়/পাতা জুড়ে নামবে একটা শূন্য'। *স্বপ্ন* কবিতায় 'ঘন অন্ধকার রাত' মেঘগর্জনে-বৃষ্টিপতনে মুখর, তারই মধ্যে 'দুলে উঠছে কাঁঠাল গাছের ঘন ডালে/ অন্ধকারের পিণ্ডগুলো/দল-পাকানো প্রেতের মতো'। *চিরযাত্রী* কবিতায় মৃত্যুর অনুষঙ্গে অন্ধকারের ঝোঁপ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে 'স্কন্ধকাটা দুঃস্বপ্ন', *কালরাত্রে* কবিতায় বাদলের দানোয় পাওয়া অন্ধকারে ঘনীভূত অবচেতনের আর্তি। এই অন্ধকার-বাচক প্রসঙ্গসমূহ কোনো না কোনোভাবে কবিহৃদয়ের পরম যন্ত্রণার দ্যোতক, যা দুর্মোচ্য। স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ব্যক্তিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংকটস্পৃষ্ট রবীন্দ্রমানস যুগজাত নাস্তিবোধে আক্রান্ত, অন্ধকারের ক্ষরণ তাই অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু অন্ধকার রবীন্দ্রমানসের একমাত্র অভিজ্ঞান নয়। পূর্বজ কাব্যসমূহের ন্যায় গদ্যকবিতা-পর্বে 'আলো'র ব্যবহার সুপ্রচুর। আলো জ্ঞানের প্রতীক, চৈতন্যের মুক্তি-নির্দেশক। বোদলেয়রীয় বিবমিষা যাকে অধিগত করেনি, পরিবর্তে গ্যেটের স্বাস্থ্যশ্রী চিন্তা ও চেতনায় দান করেছে ঋজুতা ও লাবণ্য, মানুষকে যিনি আলোকতীর্থের পথিক-রূপে জেনেছেন সেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আলো প্রথমাবধি বিচিত্র দ্যোতনায় স্পন্দিত। স্মরণীয়, *প্রভাতসংগীতে* রবিকরস্পর্শে প্রাণের জাগরণ--

পূরব-মেঘমুখে পড়েছে রবিরেখা,
অরুণরথচূড়া আধেক যায় দেখা।
তরুণ আলো দেখে পাখির কলরব--

মধুর আহা কিবা মধুর মধু সব।

(প্রভাত-উৎসব)

অথবা *ছিন্নপত্রের* বক্তব্য--

আমি আকাশ এবং আলো এত অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসি। আকাশ আমার সাকী, নীল স্ফটিকের স্বচ্ছ পেয়ালা উপুড় করে ধরেছে--সোনার আলো মদের মতো আমার রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়ে আমাকে দেবতাদের সমান করে দিচ্ছে। যেখানে আমার এই সাকীর মুখ প্রসন্ন এবং উন্মুক্ত, যেখানে আমার এই সোনার মদ সব চেয়ে সোনালি ও স্বচ্ছ, সেইখানে আমি কবি--সেইখানে আমি রাজা--সেইখানে আমার সঙ্গে বরাবর ঐ সুনীল জ্যোতির্ময় অসীমতার এই রকম প্রত্যক্ষ অব্যবহিত যোগ থাকবে।[৯]

(২ জুলাই, ১৮৯৫)

পুনশ্চের একাধিক কবিতায় রয়েছে আলোক-প্রসঙ্গ। *শুচি* কবিতায় রামানন্দ গুরুর সত্যোপলব্ধির পর সূর্যোদয়ের আলোর বিকাশ। প্রথম পূজা কবিতায় দেবতার সঙ্গে ভক্তের হাজার বছরের ক্ষুধিত দেখা একাদশী- চাঁদের পূর্ণ আলোয় সম্পাদিত। শিশুতীর্থ কবিতায় মেঘ সরে গেলে যখন শুকতারা দেখা দিল পূর্ব দিগন্তে, যখন সার্থকতার তীর্থে যাত্রীদলের চলা হ'ল শুরু, শিশুরা করতালি দিয়ে হেসে উঠল, তখন প্রভাতের প্রথম আলো ভক্তের মাথায় সোনার রঙের চন্দন পরিয়ে জানালো অভিষেক। আবার অধিনেতার হত্যার কালিমা অনাবৃত করে যখন গিরিকন্দরে ঝলকে উঠল আলো, সূর্যরশ্মির তর্জনী নিপতিত হ'ল মৃতমানুষের ললাটে, জনতার অঙ্গীকার ধ্বনিত হ'ল---ক্রোধে যাকে হনন করা হয়েছে প্রেমে তাকে গ্রহণ করার সময় এখন সমাগত। *শাপমোচন* কবিতায় সকল ভীরুতা ও সংশয় অনাবৃত করে রাজার আত্মপ্রকাশ সূর্যোদয় মুহূর্তে, যখন

অন্ধকারের মধ্যে প্রসারিত আলোকের প্রথম অনুভব। পুনশ্চ কাব্যে অস্পৃশ্যতাবিরোধী চেতনা ও মানবধর্মের জাগরণে কবিমানসে যে ইতিবাচক প্রত্যয়, তারই অনুকূলে আলোকের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসার। একই চেতনার সম্প্রসারণ অন্যত্র-- প্রাণ, লাবণ্য, উজ্জ্বলতা ও শুভ্রতার অনুষঙ্গ আলোক--

এক. একদিন নামে শেষ আলো,
নেচে যায় কচি পাতার শেষ ছেলেখেলার আসরে।
(শেষ দান)

দুই. অতি বৃহৎ বিশ্ব,
অম্লান তার মহিমা,
অক্ষুব্ধ তার প্রকৃতি।
মাথা তুলেছে দুর্দর্শ সূর্যলোকে,
অবিচলিত অকরুণ দৃষ্টি তার অনিমেষ,
অকম্পিত বক্ষ প্রসারিত
গিরি নদী প্রান্তরে।
আমার সে নয়,
সে অসংখ্যের।
বাজে তার ভেরী সকল দিকে,
জ্বলে অনিভৃত আলো,
(বিশ্বশোক)

তিন. পুব আকাশে শুভ্র আলোর শঙ্খ বাজে--
বুকের মধ্যে শব্দ যে তার
রক্তে লাগায় দোলা।

(*পয়লা আশ্বিন*)

আত্মজৈবনিক, আত্মচারণামূলক *শেষ সপ্তক* কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন 'আমি আলোর প্রেমিক' (ছয়)। অরুণ-আলোর আত্মপ্রকাশে অকুণ্ঠিত বাণীবাহক কিশলয়ের মত (তিন) রবীন্দ্রনাথও আত্ম-উন্মোচনে অধীর। তাঁর এই প্রকাশ-ব্যাকুলতা আলোক-প্রসঙ্গ অনিবার্য করেছে--

এই ছায়ার বেড়ায় বদ্ধ দিনগুলো থেকে
বেরিয়ে আসুক মন
শুভ্র আলোকের প্রাঞ্জলতায়।

(*চার*)

পত্রপুটে আলোর ব্যবহার অধিকতর ব্যাপক। 'আলোর মন্ত্র' পাওয়া কবি 'আলোর নিঃশব্দ চরণধ্বনি' শুনেছেন 'রক্তচাঞ্চল্যে' (*পনেরো*), কবি জানেন 'সৃষ্টির প্রথম রহস্য, আলোকের প্রকাশ' তাঁর গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে (*ঐ*)। এই আলো সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিতে পারে বিশ্বজগতে (*পাঁচ*)। এই আলোকের তেজোরস নিয়ে 'আমি'- রূপ বনস্পতির বিস্তার, নববর্ষার প্রথম জলধারা যেমন মাটি চুঁইয়ে গাছের শিকড় স্পর্শ করে, তেমনি 'তরুণ হেমন্তের আলো ঘুমের ভিতর দিয়ে লেগেছে' (*সাত*)। কিন্তু এই আলোর রং-ও এসেছে ধূসর হয়ে--

তখন ঝিকিমিকি বেলা,
করুণ ক্লান্তি লেগেছে মুলতানে।
ক্রমে ধূসর আলোর উপরে কালো মরচে পড়ে এল।

(*বারো*)

তথাপি *পত্রপুটের* কবি সূর্য-প্রত্যাশী। ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রকরের মত আলোর বিচিত্র প্রতিফলনে নিবিষ্ট।

শ্যামলীতে আলোক অজস্র ধারায় উৎসারিত। *উৎসর্গ* কবিতায় সবুজ গহনে দু'চোখ ডুবিয়ে সোনার সকাল অতিবাহিত করেছেন কবি; বিকেলের আলো তাঁর চোখে প্রতিভাত হয়েছে অবসন্নতায় নয়, '*স্বর্ণ*' প্রতীকের ঔজ্জ্বল্যে ঐশ্বর্যবান হয়ে। '*হারানো মন*, '*হঠাৎ-দেখা*, *অমৃত*, *কালরাত্রে* প্রভৃতি কবিতায় আলো সজীব জীবনানুভবে গ্রথিত।

এক. আমার ভালোবাসা
যেন সেই আল-ভেঙে-যাওয়া খেতের মতো
অনেক দিন হল চাষি যাকে
ফেলে দিয়ে গেছে চলে;
আনমনা আদিপ্রকৃতি
তার উপরে বিছিয়েছে আপন স্বত্ব
নিজের অজানিতে।
তাকে ছেয়ে উঠেছে ঘাস,
উঠেছে অনামা গাছের চারা,
সে মিলে গেছে চার দিকের বনের সঙ্গে
সে যেন শেষরাত্রির শুকতারা,
প্রভাত-আলোয় ডুবিয়ে দিল
তার আপন আলোর ঘটখানি।

(*হারানো মন*)

দুই. ঘন মেঘের দুর্গপ্রাচীর
পড়ল ভেঙেচুরে।
ছুটে বেরিয়ে এসেছে

প্রভাতের বাঁধন-ছেঁড়া আলো।

(*কালরাত্রে*)

তিন. সেতারের দ্রুত তালের বাজন যেন
পাতায় পাতায় আলোর চমক।

(*ঐ*)

চার. চেতনার সঙ্গে আলোর রইল না কোনো ব্যবধান।
প্রভাতসূর্যের অন্তরে
দেখতে পেলেম আপনাকে
হিরন্ময় পুরুষ;

(*ঐ*)

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, *শ্যামলী* কাব্যগ্রন্থে স্বর্ণ-প্রতীকের রয়েছে লক্ষণীয় ব্যবহার। চেতনার আলো জ্বলে ওঠা আমিত্বের ঐশ্বর্যে দীপ্যমান কবিহৃদয়ের প্রতীক এই স্বর্ণ। *উৎসর্গ* কবিতায় আলোর সোনালি রেখা, আমের শাখায় সোনার রস, সোনার সকাল ইত্যাদি স্বর্ণানুষঙ্গের উল্লেখ ছাড় *দ্বৈত* কবিতায় রয়েছে 'সোনার কাঠির ছোঁওয়া'য় চৈতন্যে আনন্দরূপের জাগরণ। *মিলভাঙা* কবিতায় অর্ধপ্রকাশিত ভালোবাসার মাধুর্য উপমিত 'ভোরবেলাকার/ কালো ঘোমটায় সূক্ষ্ম সোনার কাজে'র সঙ্গে। *অমৃত* কবিতায় 'জীবনের সাঁচ্চা সোনার জন্যে' 'সোনার মদের নেশা' ছিন্ন হয়েছে নায়কের। *শ্যামলী* কাব্যগ্রন্থে যেমন স্বর্ণ-প্রসঙ্গে ধৃত প্রাণের সজীব বিস্তার, তেমনি পূর্ববর্তী *পুনশ্চ* কাব্যেও কবিমানসের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে স্বর্ণের ঔজ্জ্বল্য ছিল দৃশ্যমান। মন্দিরের স্বর্ণচূড়া (*প্রথম পূজা*, সোনায় রাঙা স্বচ্ছ সকাল (*অস্থানে*), প্রভাতের প্রথম আলোয় ভক্তের মাথায় সোনার রঙের চন্দন লেপন (*শিশুতীর্থ*), রাজ-অমাত্যদলের স্বর্ণলাঞ্ছনখচিত

উজ্জ্বল বেশ (*ঐ*), মাটির প্রদীপ শিখায় সোনার প্রদীপ জ্বলে উঠা (*শাপমোচন*) ইত্যাদি সুবর্ণ–দ্যুতিময় বিষয় প্রায়শ সত্যদর্শন, ঐশ্বর্য ও গৌরবভাবের আবহে প্রযুক্ত। *পুনশ্চের* কবিহৃদয়ে যে নবসৃষ্টির প্রেরণা তারই আবেগে সহজাগত এই স্বর্ণাভা ও স্বর্ণ–সংকেত। অবশ্য মধ্যপর্বেও স্বর্ণচেতনা অন্তর্হিত হয়নি। যেমন *শেষ সপ্তকে*--

এক. এই বাণীই দিনে দিনে রচনা করেছে
স্বর্ণচ্ছটায় মানসী প্রতিমা
আমার বিরহ–গগনে
অস্তসাগরের নির্জন ধূসর উপকূলে।
(*ছাব্বিশ*)

দুই. অলস মনের শিয়রে দাঁড়িয়ে
হাসেন অন্তর্যামী,
হঠাৎ দেন ঠেকিয়ে সোনার কাঠি
প্রিয়ার মুগ্ধ চোখের দৃষ্টি দিয়ে,
কবির গানের সুর দিয়ে,
তখন যে–আমি ধূলিধূসর সামান্য দিনগুলির
মধ্যে মিলিয়ে ছিল,

সে দেখা দেয় এক নিমিষের অসামান্য আলোকে।

(ছত্রিশ)

তিন. নবযুগের প্রভাত
শুভ্র শঙ্খ হাতে

দাঁড়ায় উদয়াচলের স্বর্ণশিখরে,

(চল্লিশ)

পত্রপুটে--

এক. পশ্চিমের দিগ্‌বলয়ে,
সুরবালকের খেলার অঙ্গনে
স্বর্ণসুধার পাত্রখানা বিপর্যস্ত,
পৃথিবী বিহ্বল তার প্লাবনে।

(এক)

দুই. বিকালবেলার রৌদ্রকে যেমন উজাড় করে দিনান্ত
শেষ-গোধূলির ধূসরতায়
তেমনি সোনার ফসল চলে গেল
অন্ধকারের অবরোধে।

(চার)

তিন. সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিল
মহানিম গাছের ফুলের মঞ্জরিতে।

(পাঁচ)

সামগ্রিক গদ্যকবিতা-পর্বে নব উদ্দীপনার সৃজনচেতনামুখর কবিমানসের ইতিবাচক প্রান্ত নির্দেশক এই স্বর্ণ-প্রতীক। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, স্বর্ণ সহজলভ্য নয়, অনেক ক্ষেত্রে তা চরম ও পরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু। এই পর্বে বিষয় ও আঙ্গিকের নবতর অন্বেষণ কবিহৃদয়ের যে নিগূঢ় অভিলাষের সঙ্গে যুক্ত মহার্ঘ স্বর্ণ সেখানে সূত্রবদ্ধ। প্রসঙ্গত আরও পশ্চাদপসরণ করে আমরা স্মরণ করতে পারি

রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম পর্বের উজ্জ্বল নিঃসরণ, বিশিষ্ট সৌন্দর্যকল্পনার দ্যোতক স্বর্ণবর্ণ ও স্বর্ণ-প্রতীকের অনুষঙ্গ--

সন্ধ্যার কনকবর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল; উষার স্বর্ণে
গড়িছ মেখলা;
(*মানসসুন্দরী*)

অথবা,

আঁধার রজনী আসিবে এখনি
মেলিয়া পাখা,
সন্ধ্যা-আকাশে স্বর্ণ-আলোক
পড়িবে ঢাকা।
(*নিরুদ্দেশ যাত্রা*)

উত্তরকাব্যে নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যচারিতা নয়, রবীন্দ্রমানসে জীবনঘনিষ্ঠতার প্রাধান্য। *পুনশ্চ* কাব্যের *নাটক* কবিতায় চির-অধরা সৌন্দর্যপ্রতিমার প্রতীক উর্বশীর ভাষ্য 'মর্ত্যকে প্রয়োজন আমার, আমাকে প্রয়োজন মর্ত্যের' *সোনার তরী* পর্বের মর্ত্যচেতনা স্মৃতিগোচর করে। স্বাভাবিকভাবে ধূলো, মাটি, ক্ষেত, প্রান্তর, বৃক্ষ, শিকড় ইত্যাদি মৃৎ-বিষয়ক বিষয়-আশয় গদ্যকবিতা-পর্যায়ে লক্ষণীয়। *শেষ সপ্তকের চুয়াল্লিশতম* কবিতায় কবি লিখেছেন--

চিরদিন মাটি আমাকে ডেকেছে
পদ্মার ভাঙনলাগা
খাড়া পাড়ির বনঝাউবনে,
গাঙশালিকের হাজার খোপের বাসায়;

সর্ষে-তিসির দুইরঙা খেতে
গ্রামের সরু বাঁকা পথের ধারে,
পুকুরের পাড়ির উপরে।
আমার দু-চোখ ভ'রে
মাটি আমায় ডাক পাঠিয়েছে
শীতের ঘুঘুডাকা দুপুরবেলায়,
রাঙা পথের ওপারে।

এই কবিতায় মাটি একদিকে নবীন শ্যামলতার বাণীবহ, প্রেম-প্রতিমায় অন্বিত--

আমি ভালোবেসেছি
বাংলাদেশের মেয়েকে;
যে দেখায় সে আমার চোখ ভুলিয়েছে
তাতে আছে যেন এই মাটির শ্যামল অঞ্জন,
ওর কচি ধানের চিকন আভা।

অন্যদিকে কবির দার্শনিক ভাবনা-বেদনার প্রচ্ছায়ে কাল থেকে কালাতীতে তার সর্বংসহ এবং পরম শুশ্রূষাকারীর ভূমিকা--

যার মধ্যে সব বেদনার বিস্মৃতি,
সব কলঙ্কের মার্জনা,
যাতে সব বিকার সব বিদ্রূপকে
ঢেকে দেয় দূর্বাদলের স্নিগ্ধ সৌজন্যে;
যার মধ্যে শত শত শতাব্দীর
রক্তলোলুপ হিংস্র নির্ঘোষ
গেছে নিঃশব্দ হয়ে।

গদ্যকবিতার অন্যত্রও কবির মৃন্ময় চেতনা এভাবে কখনও জাগতিক এবং কখনও দার্শনিক অনুভাবনায় সম্পৃক্ত। *পুনশ্চে* কবির দৃষ্টি হরণ করেছে সবুজ মাঠের সঙ্গে রাঙা মাটির মিতালি (*খোয়াই*), *শেষ সপ্তকে* বৃক্ষ শিকড়ের কাঙালপনায় (*চব্বিশ*) অভিব্যক্ত তাঁর গভীর জীবনানুরাগ, পত্রপুটে কবি অনুভব করেছেন 'হঠাৎ সোঁদা গন্ধের দীর্ঘনিশ্বাস উঠল মাটি থেকে' (নয়), শ্যামলীতে শুনেছেন সবুজ ভাষায় ঘাসে ঘাসে মাটির ছড়া-কাটা (শ্যামলী)। তাঁর দৃষ্টি ও হৃদয় সমন্বিত বোধের এক নরম সৈকতে--

> ওরাওঁ জাতের মালী ও মালিনী ভোর হতে লেগে আছে--
> মাটি খোঁড়াখুঁড়ি, জল ঢালাঢালি গাছে।
> মাটিগড়া যেন নিটোল অঙ্গ, মাটির নাড়ীর টানে
> গাছপালাদের স্বজাত বলেই জানে।
>
> (*উৎসর্গ*)

অপরদিকে কখনও তপ্ত মাঠে বেজেছে দূরের বাঁশি (*ফাঁক/ পুনশ্চ*), মোটা মাটির পর্দায় ঢাকা পড়েছে আলো ও আনন্দময় চৈতন্য (*ছয়/শেষ সপ্তক*), গাছের শুকনো পাতা মাটিতে ঝরে শোধ করেছে মাটির দেনা (*সাত/পত্রপুট*) এবং কবি উপলব্ধি করেছেন মৃত্যুর কাদামাটিতে ঢাকা পড়া আত্মার মুক্তরূপ (*দশ/ঐ*)।

'ধূলো'র প্রতীকেও অনুরূপ ভাব ও ভাবনার সম্প্রসারণ। একদিকে 'ঘোড়ার খুরে উড়েছে ধূলো/ধরণী যেন পিছু ঢাকছে আঁচল দুলিয়ে' (*উনিশ/শেষ সপ্তক*), কবিকণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বেদমন্ত্র 'পৃথিবীর ধূলি মধুময়' (*পাঁচ/ পত্রপুট*), অন্যদিকে 'যে পথিক অস্তসূর্যের/ ম্লায়মান আলোর পথ নিয়েছে' 'ধূলোর হাতে'ই তাকে উজাড় করে

দিতে হচ্ছে 'সমস্ত আপনার দাবি' (ছয়/*শেষ সপ্তক*), তখন সেই 'ধুলোর উদাসীন বেদীটার সামনে' নৈবেদ্য অর্পণ বৃথা। মহাকালের রথচক্রের নির্মম পেষণে 'ভাঙা পাত্র ধুলায় যায় গুঁড়িয়ে' (তেতাল্লিশ/ঐ)। বহু বিপরীতে লগ্ন বিচিত্ররূপ বসুন্ধরাকে কবি তাই শেষপর্বে প্রণতি জানিয়েছেন--

শুভে অশুভে স্থাপিত তোমার পাদপীঠে,
তোমার প্রচণ্ড সুন্দর মহিমার উদ্দেশে
আজ রেখে যাব আমার ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত জীবনের প্রণতি।
বিরাট প্রাণের, বিরাট মৃত্যুর গুপ্তসঞ্চার
তোমার যে মাটির তলায়
তাকে আজ স্পর্শ করি, উপলব্ধি করি সর্ব দেহে মনে।

(*তিন/পত্রপুট*)

'শস্যরিক্ত মাঠ' বেশ কয়েকটি কবিতায় কবির অন্ত্যপর্বের জীবন-চিত্রের প্রতীক--

এক. মনে পড়ে শীতের মধ্যাহ্নে,
যখন গোরুচরা শস্যরিক্ত মাঠের দিকে
চেয়ে চেয়ে বেলা যায় কেটে;
মনে পড়ে, যখন সঙ্গহারা সায়াহ্নের অন্ধকারে
সূর্যাস্তের ওপার থেকে বেজে ওঠে
ধ্বনিহীন বীণার বেদনা।

(*দুই/শেষসপ্তক*)

দুই. যাব লক্ষ্যহীন পথে,

সহজে দেখব সব দেখা,
শুনব সব সুর,
চলন্ত দিনরাত্রির
কলরোলের মাঝখান দিয়ে।
আপনাকে মিলিয়ে নেব
শস্যশেষ প্রান্তরের
সুদূরবিস্তীর্ণ বৈরাগ্যে।

(চার, ঐ)

তিন. আমার ছুটি চার দিকে ধু ধু করছে
ধান-কেটে-নেওয়া খেতের মতো।

(দুই/পত্রপুট)

চার. বিকালবেলার রৌদ্রকে যেমন উজাড় করে দিনান্ত
শেষ-গোধূলির ধূসরতায়
তেমনি সোনার ফসল চলে গেল
অন্ধকারের অবরোধে।
তার পরে শূন্যমাঠে অতীতের চিহ্নগুলো
কিছুদিন রইল মৃত শিকড় আঁকড়ে ধরে--
শেষে কালো হয়ে ছাই হল আগুনের লেহনে।

(চার/ঐ)

পাঁচ. জীবনের পরিত্যক্ত ভোজের ক্ষেত্র পড়ে আছে পিছন দিকে
অনেক দিনের ছড়ানো উচ্ছিষ্ট নিয়ে।

(বারো/ঐ)

সোনার তরী কবিতায় সারাজীবনের সঞ্চয় তরীতে তুলে দেয়ার পর ব্যক্তিজীবনের অনন্ত নৈঃসঙ্গ্য জাগ্রত হয়েছিল। সেই নৈঃসঙ্গ্য অধিকতর শূন্যতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে শস্যশূন্য মাঠের প্রতীকে। একদিন যেখানে ছিল অজস্র শস্যসম্ভার আজ সেখানে তার স্মৃতিমাত্র অবশিষ্ট; চতুর্থ স্তবকে সেই স্মৃতিটুকুও আগুনের লেলিহান শিখায় নির্বাপিত। প্রসঙ্গত ছিন্নপত্রের রবীন্দ্রভাষ্য স্মরণযোগ্য--

> আকাশের শূন্যতা, সমুদ্রের শূন্যতা আমাদের চিরাভ্যস্ত; তার কাছে আমরা আর কিছু দাবি করি নে--কিন্তু ভূমির শূন্যতাকে সব চেয়ে বেশি শূন্য বলে মনে হয়। কোথাও গতি নেই, জীবন নেই, বৈচিত্র্য নেই; যেখানে ফলে শস্যে তৃণে পশুপক্ষীতে ভরে যেতে পারত সেখানে একটি কুশের অঙ্কুর পর্যন্ত নেই--কেবল একটা উদাস কঠিন নিরবচ্ছিন্ন বৈধব্যের বন্ধ্যাদশা।[১০]
>
> (২৮ নবেম্বর, ১৮৯৪)

রবীন্দ্রমানস কখনোই নয় পুরোপুরি মর্ত্যমুখী অথবা অসীমচারী; যুগপৎ সীমা ও অসীমকে ধারণ করে তাঁর কবিতার গঠন ও পুনর্গঠন। তাই গদ্যকবিতা-পর্বে পার্থিব জীবনের মোহ ও বেদনা বিসর্পিত হলেও অসীমের আহ্বান উপেক্ষিত হয়নি। 'মাটি'র পাশাপাশি বিভিন্ন কবিতায় যোজিত 'আকাশ'-প্রসঙ্গ, সুদূর ও অন্তহীনতার ব্যঞ্জনা নিয়ে। ছিন্নপত্রের বক্তব্যেও ইতিপূর্বে আমরা আকাশের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর আকর্ষণ অনুভব করেছি।

> পুনশ্চের স্মৃতিশায়ী বন্দী বালকের স্বপ্ন--
>
> আমার হনুমান আসত বছরে বছরে আষাঢ় মাসে
>
> আকাশ কালো করে
>
> সজল নবনীল মেঘে।

আনত তার মেদুর কণ্ঠে দূরের বার্তা,
যে দূরের অধিকার থেকে আমি নির্বাসিত।
ইমারত-ঘেরা ক্লিষ্ট যে আকাশটুকু
তাকিয়ে থাকত একদৃষ্টে আমার মুখে,
বাদলের দিনে গুরুগুরু ক'রে তার বুক উঠত দুলে।
বট গাছের মাথা পেরিয়ে কেশর ফুলিয়ে দলে দলে
মেঘ জুটত ডানাওয়ালা কালো সিংহের মতো।

(*বালক*)

শেষসপ্তকের প্রৌঢ় কবিমানস 'উড়তি ধুলোয় আকাশের নীলিমা'তে পেয়েছে 'ধূসরের আভাস' (আট), তথাপি 'দূরের ব্যাপ্তি' নিয়ে শিল্পীহৃদয়ের সঙ্গে হয়েছে একাত্ম--

এই দূর আকাশ সকল মানুষেরই অন্তরতম;
জানলা বন্ধ, দেখতে পাইনে।
বিষয়ীর সংসার, আসক্তি তার প্রাচীর,
যাকে চায় তাকে রুদ্ধ করে কাছের বন্ধনে।
ভুলে যায় আসক্তি নষ্ট করে প্রেমকে,
আগাছা যেমন ফসলকে মারে চেপে।
আমি লিখি কবিতা, আঁকি ছবি।
দূরকে নিয়ে সেই আমার খেলা;
দূরকে সাজাই নানা সাজে,
আকাশের কবি যেমন দিগন্তকে সাজায়
সকালে সন্ধ্যায়।
কিছু কাজ করি তাতে লাভ নেই, তাতে লোভ নেই,

তাতে আমি নেই।
যে কাজে আছে দূরের ব্যাপ্তি
তাতে প্রতি মুহূর্তে আছে আমার মহাকাশ।

(পনেরো)

এই মহাকাশ মহামুক্তির প্রতীক, বিষয়ীর বন্ধনদশার বিপরীতে প্রেম ও স্বপের অনন্ত ছাড়পত্র।

পত্রপুটে নানা সূত্রে আকাশের উদ্ভাস। 'গোরুর গাড়ির' বিছিয়ে দেয়া 'গেরুয়া ধুলো' ফিকে 'নীল আকাশ' স্পর্শ করলেও (সাত) কবির দৃষ্টি এড়ায়নি 'অস্ত-আকাশে' 'নতুন তুলির টান' (দুই), শ্রুতিতে বেজেছে 'কেশর-ফোলা সিংহের' মত আকাশের গর্জন (*তিন*), কখনও এসেছে 'সমস্ত আকাশের তারার ছায়াগুলিকে/ আঁচলে ভরে নেবার আকাশ' (*দুই*), আবার কখনও ঘনীভূত হয়েছে 'নীল আকাশে' 'বিরহের সুনিবিড়' শূন্যতা (ঐ), তখন কেবলি 'আকাশের আলোয়' 'মেঠো বাঁশির সুর মেলে দেওয়া' (*পাঁচ*)।

সুর বা সঙ্গীত এই ধূলিমলিন বাস্তবে অনির্বচনীয়ের ইঙ্গিতবাচক। পুনশ্চে নানা সূত্রে গান, সুর, আলাপ ও বাঁশির ধ্বনি। সংগীত-সম্পৃক্ত তিনটি কবিতা এই কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। কোমল-গান্ধার; বাঁশি ও গানের বাসা। আকাশ যখন ঝাঁ ঝাঁ করে দুপুর রোদে, অবকাশের মুহূর্তে ভীড় করে অনেক জমে-থাকা স্মৃতি, দূরযানী উদাস মন তখন বাঁশির সুর শোনে--

কাঁঠালতলার ঘন ছায়া
তপ্ত মাঠের ধারে
দূরের বাঁশি বাজায়

অশ্রুত মূলতানে।

(ফাঁক)

ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে বাঁধা স্বপ্নের আবাসেও বাঁশি বাজে; এই বাঁশি সাঁওতালী সুরে অপরিচিতের মোহ ছড়ায়। বাঁশি বাজে কিনু গোয়ালার গলিতে-- আমের খোসা, মাছের কানকো, মরা বেড়াল-ছানা ও অজস্র ছাইপাশ নিয়ে যে গলির বাতাস বীভৎস, যে গলির বাসিন্দা হরিপদ কোরানি ধলেশ্বরী নদীর তীরে পিসিদের গ্রামে বিয়ের লগ্ন পাকা থাকা সত্ত্বেও পালিয়ে আসে এবং কলে-পড়া জন্তুর মত মূর্ছিত অস্তিত্ব নিয়ে কোনরকমে দিন অতিবাহিত করে সেই গলিতেও কখনও গভীর রাতে--

সিন্ধু-বারোয়াঁয় লাগে তান,
সমস্ত আকাশে বাজে
অনাদি কালের বিরহবেদনা।

এবং তখন দ্বিতীয় হৃদয়ের জাগরণে আকবর বাদশা ও হরিপদ কেরানির কোনো প্রভেদ থাকে না, বাঁশির সুরে সুরে 'পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর' কোন এক মধুর অস্তিত্বের আবাহন জাগে। অধরা সুরের প্রতীকছায়ায় রবীন্দ্রনাথ বাস্তবকে দিয়েছেন বাস্তবাতীতের স্পর্শ। স্মরণীয়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বাঁশির সঙ্গে সম্পৃক্ত রাধা হৃদয়ের বিরহ-বেদনা, জীবাত্মার পরম বন্ধন এবং কৃষ্ণের তথা ভগবানের গভীর আহবান।

অপূর্ণ যখন চলেছে পূর্ণের দিকে
তার বিচ্ছেদের যাত্রাপথে

আনন্দের নব নব পর্যায়।
পরিপূর্ণ অপেক্ষা করছে স্থির হয়ে;
নিত্যপুষ্প, নিত্যচন্দ্রালোক,
নিত্যই সে একা--সেই তো একান্ত বিরহী।
যে অভিসারিকা তারই জয়,
আনন্দে সে চলেছে কাঁটা মাড়িয়ে।
ভুল বলা হল বুঝি।
সেও তো নেই স্থির হয়ে যে পরিপূর্ণ,
সে যে বাজায় বাঁশি, প্রতীক্ষার বাঁশি,-
সুর তার এগিয়ে চলে অন্ধকার পথে।
বাঞ্ছিতের আহবান আর অভিসারিকার চলা
পদে পদে মিলছে একই তালে।
তাই নদী চলেছে যাত্রার ছন্দে,
সমুদ্র দুলেছে আহ্বানের সুরে।

(*বিচ্ছেদ*)

শাপমোচন কবিতায় অন্ধকারে বেজেছে সেই সুর, বয়ে এনেছে অনির্বচনীয়ের আমন্ত্রণ, সেই গানের সুরের খেয়া বেয়ে ভ্রান্তিপাশবদ্ধ কমলিকার ঘটে মুক্তি--

বীণার গুঞ্জরণ আকাশে মেলে দেয় এক অন্তহীন অভিসারের পথ।
রাগিনী-বিছানো সেই শূন্যপথে বেরিয়ে পড়ে তার মন।
কার দিকে। দেখার আগে যাকে চিনেছিল তারই দিকে।

বাঁশির এই সুরধ্বনি পুনরায় উচ্ছিত *শ্যামলী* কাব্যগ্রন্থে। *বাঁশিওয়ালা* নামের একটি সম্পূর্ণ কবিতা এই কাব্যে স্থান পেয়েছে। সে বাঁশির ডাক রক্তে তরঙ্গ তোলে--

আমার রক্তে নিয়ে আসে তোমার সুর--
ঝড়ের ডাক, বন্যার ডাক, আগুনের ডাক,
পাঁজরের উপরে আছাড়-খাওয়া
মরণ-সাগরের ডাক,
ঘরের শিকল-নাড়া উদাসী হাওয়ার ডাক।

এই ডাক কখনো অচেনা পথে স্বপ্নে চলার ইঙ্গিত নিয়ে আসে। মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় স্বচ্ছ আকাশের নীচে 'কোন্ নির্বাক্ রহস্যের সামনে' (অকাল ঘুম)।

শ্যামলী কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতা *শ্যামলী*, যেখানে একদিকে গড়া অন্যদিকে ভাঙার আয়োজন, একদিকে ঘরের মোহ অন্যদিকে যাত্রার নিরাসক্তি। গভীর জীবনপ্রেমিক অথচ দার্শনিক চেতনাবিদ্ধ রবীন্দ্রহৃদয়ের ধারক ও বাহক, সীমার প্রতীক 'মাটি' এবং অসীমের প্রতীক 'বাঁশি'র এখানে সহাবস্থান।

বাসা বেঁধেছি আলগা মাটিতে--
যে চলতি মাটি নদীর জলে এসেছিল ভেসে,
যে মাটি পড়বে গলে শ্রাবণধারায়।
যাব আমি।
তোমার ব্যথাবিহীন বিদায়দিনে
আমার ভাঙা ভিটের 'পরে গাইবে দোয়েল লেজ দুলিয়ে।
এক শাহানাই বাজে তোমার বাঁশিতে, ওগো শ্যামলী,
যেদিন আসি আবার যেদিন যাই চলে।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা-পর্যায়ের কতিপয় নির্বাচিত প্রতীক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরিশেষে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, প্রতীকের কাব্যমূল্য শুধু কবিতার বিষয়-রূপায়ণে নয়, বহু সূক্ষ্ম-বঙ্কিমে রেখায়িত, সৃজনরহস্য-গভীর, সাদা-কালোর ঐক্যতানে সংগীতময় কবিচেতনায় জাল ফেলে একমাত্র প্রতীকই হয়ে উঠতে পারে সেই অপরূপ রহস্যলোক উন্মোচনের দুর্লভ চাবিকাঠি।

তথ্যনির্দেশ

১ জীবনানন্দ দাশ, কবিতার কথা, *কবিতার কথা,* কলকাতা, তৃ-সং ১৩৭৯, পৃ ১

২ *সংস্কৃত কবিতা ও আধুনিক যুগ,* প্রবন্ধ-সংকলন, কলকাতা, প্রথম দে'জ সং ১৯৮২, পৃ ২১৪

৩ শতরূপা মানসী, *বাংলা কবিতার নবজন্ম,* কলিকাতা, ১৩৫৯, পৃ ৫৩১

৪ পত্রসংখ্যা ১১৮, *ছিন্নপত্র,* বিশ্বভারতী, ১৯৭৫, পৃ ২৩৫

৫ *ঐ*, পত্রসংখ্যা ১১২, পৃ ২২৬

৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পোস্ট্‌মাস্টার, *গল্পগুচ্ছ,* বিশ্বভারতী, ১৯৭৭, পৃ ১৭

৭ পত্রসংখ্যা ৬৬, *চিঠিপত্র,* চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৫০, পৃ ১৫২-৫৩

৮ চিত্র ও চিত্রকল্প/রবীন্দ্রগোধূলি, উত্তর *প্রসঙ্গ,* কলিকাতা, ১৯৮৬, পৃ ৪৬

৯ পত্রসংখ্যা ১৪৫, *ছিন্নপত্র,* পৃ ২৭৪

১০ *ঐ*, পত্রসংখ্যা ১৩১, পৃ ২৫৬